রবীন্দ্রসঙ্গীতে সঙ্গত

সঙ্গত বলিতে কণ্ঠ বা যন্ত্র (তন্ত্র) সঙ্গীত পরিবেশনে সহায়তা করা বোঝায়। যন্ত্র বা নৃত্য অপেক্ষা কণ্ঠসঙ্গীতের ক্ষেত্রে সঙ্গত স্বতন্ত্রভাবে হইয়া থাকে। কণ্ঠসঙ্গীতের প্রকার ভেদে—যেমন খেয়াল, ঠুংরী, তারানা, ধ্রুপদ-ধামার ইত্যাদি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশনে সঙ্গত যে ভাবধারায় হইবে, কোন ভক্তি রসাভিসিক্ত সঙ্গীত পরিবেশনের সময় সেইরূপ ভাবে হইবে না। আবার

স্বদেশী গান, হাসি ঠাট্টার গান, খেলার গান ইত্যাদি বহু প্রকার ভাবধারার গানের চরিত্র যেমন পৃথক, তদ্রূপ সেই সেই গানের ভাবধারা অনুযায়ী সঙ্গতের মেজাজও পরিবর্তিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। সুতরাং সঙ্গতের প্রধান কাজ হইল গান যে প্রকৃতির হইবে সঙ্গতও হুবহু সেই প্রকৃতির হইয়া গানের ভাবধারা অর্থাৎ কাব্য, সুর ও ছন্দের মিলিত রূপ মানব মনে প্রস্ফুটিত করা। ছন্দ বহুল গান, হাসি, উদ্দীপকের গান, চাষ করার গান প্রভৃতি চটুল প্রকৃতির হাল্‌কা রসের গানে সঙ্গতও (ব্যবহৃত যন্ত্রাদিও) একটু উত্তাল বা চটুল প্রকৃতির হইলে বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মনে প্রাণে আধ্যাত্মিক ভাবের ভাবুক ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার রচিত সকল পর্যায়ের গানের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন গানের সংখ্যাই বেশী। ইহা ছাড়া তিনি একজন উঁচু দরের কবি ছিলেন বলিয়া তাঁহার অধিকাংশ গান কাব্য-সম্পদে ভরপুর। তাঁহার রচনাবলী যেমন কাব্য সম্পদে সমৃদ্ধ, সেইরূপ তাঁহার গানে যাহাতে সুরের বা ভাবের কোন ঘাটতি না ঘটে সেই দিকে নজর দিয়া মার্জিত ভাবেই সঙ্গত হওয়া উচিত। কারণ তিনি নিপুণ শিল্পীর ন্যায় বিভিন্ন রাগ-রাগিনীর মিশ্রণ ঘটাইয়া এমন ভাবে তাঁহার রচিত গানে সুরারোপ করিয়াছিলেন যাহা গঙ্গা-যমুনা মিলন স্বরূপ হইয়াছে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ চাহিয়াছিলেন যে, ছন্দের সিঁড়ি বাহিয়া কাব্য এবং সুর একাত্ম হইয়া এমন ভাবে চলিবে যে, উভয়কেই সমান সুখী বলিয়া প্রতিভাত হইবে। অনেক সময় দেখা যায় যে, রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনে তবলা, মৃদঙ্গ বা অন্যান্য সহায়ক যন্ত্রগুলি এত মাত্রাতিরিক্ত ভাবে বাজান হয় যে, তখন গানের কাব্যাংশ তো বোঝা যায়ই না, এমনকি গানের সুরও শোনা যায় না। এইরূপ সঙ্গীত পরিবেশন রস-সৃষ্টির পরিবর্তে শ্রোতার বিরক্তির কারণ হইয়া ওঠে।

সুতরাং রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনে উহার কাব্য ও ভাবধারা হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য সঙ্গত মার্জিতরূপে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। মনে রাখিতে হইবে যে সঙ্গত যেন কোন অবস্থায় গানকে ছাপাইয়া না যায়।